দেবদাস

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

গ্রাম ও শহর, পুরুষ ও নারী, প্রেম ও বিরহ, শৈশব ও যৌবন, পথ ও গৃহ, বিবাহ ও বিচ্ছেদ—এ রকম বেশকিছু জোড়ে ভরে আছে এই আখ্যান।

'শুধু দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমরা যে-কেহ এ কাহিনি পড়িবে, হয়তো আমাদেরই মতো দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মতো এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিয়ো। প্রার্থনা করিয়ো, আর যাহাই হউক, যেন তাহার মতো এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে—যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও একফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।' এ ভাবেই শরৎ বাবু শেষ করেছেন তাঁর উপন্যাস, দেবদাসের কাহিনি। নায়কের জন্য লেখকের করুণার অন্ত নেই।

সত্যিই তো এমন মৃত্যুতে দুঃখ পায় না অমন পাষণ্ড পাঠক কে-ই বা হতে চায়। একটু সহানুভূতি বই তো কিছু নয়। দেবদাসের জন্য এটুকু করবে না এমন মানুষ বাংলা মূলকে কেন ভূ-ভারতে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। দেবদাসের মতো প্রেমিক হৃদয়ের মৃত্যু আর একটু সুখের হলেই বোধ হয় ভালো হতো এ কথা মনে হলে কাউকে অন্তত দোষ দেওয়া যায় না!

দেবদাসের জন্য লেখক ও পাঠক দু'পক্ষই চোখের জল ফেলুন ক্ষতি নেই। কিন্তু পাঠক হিসেবে লেখকের কাছে একটা প্রশ্ন তো করাই যায়—পার্বতীর কী হলো? তার সন্ধান কি লেখক করেছেন? পার্বতীর দিবা-রাত্র কীভাবে কাটছে, জানতে কি ইচ্ছা করে না আমাদের? উত্তর শরৎ বাবু দেননি এমনটা নয়। বাঁ হাতে ফুল দিলেও আখ্যানের নায়িকার কথা একেবারে লিখবেন না তা কী হয়! তবে কি না তাঁর অভিধান থেকে যে কৌশলী শব্দ চয়নে তিনি দেবদাসের জন্য পাঠকের চোখে জল এনেছেন তেমনটা পার্বতীর বেলায় অনুপস্থিত। 'তাহার পর দাসী-চাকর মিলিয়া ধরাধরি করিয়া পার্বতীর মূর্ছিত দেহ টানিয়া আনিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল। পরদিন তাহার মূর্ছাভঙ্গ হইলো, কিন্তু সে কোনো কথা কহিল না। একজন দাসীকে ডাকিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রিতে এসেছিলেন না? সমস্ত রাত্রি! তাহার পর পার্বতী চুপ করিয়া রহিল।' পার্বতীর প্রেমহীন উষর অবশিষ্ট জীবন, নিঃসঙ্গ যৌবন শূন্যতা বুকে নিয়ে কী করে কাটছে তার আভাসটুকুও শরৎ বাবু দিতে পারছেন না। কেবল তার নীরবতার কারণটুকুতে কিছুটা মাত্র অনুমান করা যায়।

লেখকের দিক থেকেও পার্বতীর কথা ভাবার তেমন তাগিদ দেখা যায় না। শরৎ বাবু জানিয়ে দেন, 'এখন পার্বতীর কী হইয়াছে, কেমন আছে জানি না। সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করে না।' আর চন্দ্রমুখী? পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সেই যে 'আর একবার প্রণাম করিয়া চন্দ্রমুখী কাঁদিয়া কক্ষান্তরে পলাইয়া গেল' তারপর আর তার দেখা নেই আখ্যানে। অবশ্য ষোড়শ পরিচ্ছেদের শুরুতে একবার তার প্রসঙ্গ সরাসরি উত্থাপিত হয়েছে।

দেবদাস 'চন্দ্রমুখীকে চিঠি লিখিয়াছিল, বউ, মনে করিয়াছিলাম, আর কখনও ভালোবাসব না। একে তো ভালোবেসে শুধু হাতে ফিরে আসাটাই বড় যাতনা, তার পরে আবার নতুন করে ভালোবাসতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা সংসারে আর নেই।' দেবদাসের চিঠির উত্তরে চন্দ্রমুখীর নিশ্চয় কিছু বলার ছিল। হয়তো সে বলেওছিল হৃদয়ের দুটো কথা, কিন্তু শরৎ

বাবুর তাতে আগ্রহ নেই। লেখক সাফ জানিয়ে দেন, 'প্রত্যুত্তরে চন্দ্রমুখী কী লিখিয়াছিল তাহাতে আবশ্যক নাই।'

'দেবদাস'-এর চন্দ্রমুখী আর 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণীর অবস্থা সামাজিক পরিচিতির দিক থেকে অনেকটা এক রকম। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ আর্জিটুকু পাঠকের কাছে অন্তত জানিয়েছিলেন, সে যেন রোহিণীর জন্য একটুকু 'আহা' করে। শরৎ বাবু এটুকু জায়গাও চন্দ্রমুখীর জন্য রাখেননি! দেবদাস তার ধ্যান-জ্ঞানকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে বসে আছে যে দেবদাস বিনা তার অন্য ভাবনা নেই। হতে পারে দেবদাস মহৎ প্রেমিক, কিন্তু প্রেম তো পার্বতী ও চন্দ্রমুখীর হৃদয়েও কিছু কম ছিল না! সে কথা শরৎ বাবু ছাড়া কে বেশি বুঝবে!

কিন্তু দিনাবসানে লেখকের সবটুকু সহানুভূতিই পেল দেবদাস। পার্বতীর জন্য কেবল নীরবতা। আর গোত্র-পদবিহীন চন্দ্রমুখী, সে তো নর্তকী—হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কী-ই বা হতে পারে, তার দেহ-মনের খবর আখ্যান পড়ে জানতে পারব এমন আশা করাই বাতুলতা।

২

শরৎ বাবুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ যা-ই ব্যক্ত করি না কেন, এখনও পর্যন্ত জিত তাঁরই। দেবদাসের জন্য চোখের জল ফেলার লোকের অন্ত নেই। আসমুদ্র হিমাচল চলেছে দেবদাসের শোক মিছিলে। ভারতভূমিতে এমন কোনো ভাষা নেই যাতে শরৎ চন্দ্রের 'দেবদাস' অনূদিত হয়নি। সেই ১৯২৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কতগুলো 'দেবদাস' রুপালি পর্দায় ঝলমল করেছে তারও হিসাব মেলানো সহজ নয়। বাংলায় ছ'টা 'দেবদাস' ছাড়াও হিন্দিতে রয়েছে চারটি, তেলুগু ভাষায় দু'টি, উর্দুতে দু'টি। এ ছাড়া অহমিয়া এবং মালয়ালি ভাষাতেও শরৎ চন্দ্রের 'দেবদাস' চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বক্স অফিসের হিসাবে প্রায় প্রত্যেকটি 'দেবদাস'-ই দর্শকের আশীর্বাদ লাভ করেছে। কেবল রুপালি পর্দা নয়, ছোটো পর্দায়ও বাংলা ও হিন্দিতে 'দেবদাস' টেলিভাইজড হয়েছে।

১৯২৮ সালে প্রথম দেবদাস তৈরি হয়। পরিচালক ছিলেন নরেশ মিত্র। তারপর ১৯৩৫, ১৯৭৯, ১৯৮২, ২০০২ এবং ২০১৩-তে 'দেবদাস' চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। শেষ বাংলা 'দেবদাস' (এখনও পর্যন্ত) নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশে। পরিচালক চাষি নজরুল ইসলাম। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতের কথা বলতে গেলে বিগত শতাব্দীর দুয়ের দশক থেকে আজ পর্যন্ত, কেবল চার ও নয়ের দশক ব্যতিক্রম, প্রত্যেক দশকে কোনো না কোনো ভারতীয় ভাষায় 'দেবদাস'-এর চলচ্চিত্রীকরণ ঘটেছে! দেখে-শুনে মনে হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের যা-ই ঘটুক না কেন 'দেবদাস' নির্মাণের অবিরাম ধারায় কোনো দিনই ছেদ ঘটবে না।

কী আছে দেবদাসের কাহিনিতে যা তাকে লোকপ্রিয় করে তুলেছে? আপাতদৃষ্টিতে 'দেবদাস' প্রেম আর বিচ্ছেদ মিলেমিশে তৈরি হওয়া একটি ট্র্যাজেডি। মনে হয় দর্শককে অনেক বেশি করে আকর্ষণ করে 'নস্টালজিয়া' এবং হারিয়ে যাওয়া প্রেম। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে গেলে বলা যায় নায়কের মেলাঙ্কলিয়া থেকে উদ্ভূত পৌরুষের আদর্শ উদাহরণ 'দেবদাস'। আখ্যানের উপাদানগুলোকে বিশ্লেষণ করলেও 'দেবদাস'-এর লোকপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণ কী তার কিঞ্চিৎ আভাস মিলতে পারে। গ্রাম ও শহর, পুরুষ ও নারী, প্রেম ও বিরহ, শৈশব ও যৌবন, পথ ও গৃহ, বিবাহ ও বিচ্ছেদ—এ রকম বেশকিছু জোড় এই আখ্যানে পাওয়া যেতে পারে যেগুলোকে ঘিরে অনাধুনিকতা ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বটি জনপ্রিয় ঢঙে ফুটে ওঠে দেবদাসের কাহিনিতে।

প্রমথেশ বড়ুয়া'র হিন্দি 'দেবদাস' (১৯৩৫)-এর একটি দৃশ্যের কথা

বলা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে। দেবদাস চলল কলকাতা শহরে। পর্দায় আবির্ভাব ঘটে এক অন্ধ ফকিরের। সে গায়, 'তুঝে জানাহি পড়েগা... মাত ভুল মুশাফির'। ক্যামেরা কাট করে চলে যায় ছুটন্ত ট্রেনের দৃশ্যে। ফিরে আসে আবার ফকিরের কাছে। সেখান থেকে কলকাতা, গঙ্গাতীরের আধুনিক নগর। দেবদাস দৃশ্যত ঢুকে পড়ে আধুনিকতার পরিসরে। পিছনে ফেলে আসে বাংলাদেশের ছায়া সুনিবিড় গ্রাম, জমিদার পিতার সুখী গৃহকোণ ও সারল্যমাখা শৈশবের প্রেম। কী আশ্চর্য, প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস'-এর দু'দশক পরে তৈরি সত্যজিৎ রায়ের অপু ত্রয়ী ছবিরও মূল সুর ওই একই—নিশ্চিন্দিপুর থেকে অপুর যাত্রা নাগরিক আধুনিকতার দিকে!

৩

'দেবদাস' যে ক'খানি তৈরি হয়েছে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় তার মধ্যে প্রায় সবক'খানিই দেবদাসের গল্প। ব্যতিক্রম কেবল বিমল রায়ের 'দেবদাস' (১৯৫৫)। পার্বতী ও চন্দ্রমুখীর প্রতি যে অন্যায়টা শরৎ বাবু এবং অন্য সকলে করলেন তা থেকে অনেকটাই মুক্ত বিমল রায়ের 'দেবদাস'। তাঁর 'দেবদাস' অনেকটাই পারো এবং চন্দ্রমুখীর দেবদাস। ছবিখানি দেখলে প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় ছবির প্রথম অংশটি পারোর, আর দ্বিতীয়াংশটি চন্দ্রমুখীর। দেবদাস এই দুই নারী হৃদয়ের মধ্যে যোগসূত্র মাত্র। ছবিতে চন্দ্রমুখী এবং পার্বতীর দেখা হওয়ার দৃশ্যটির কথা উল্লেখ না করে পারছি না। চন্দ্রমুখী পদব্রজে, আর পার্বতী চলেছে পালকিতে। একবার—মাত্র চার চক্ষুর মিলন হলো। চোখে চোখ পড়তেই একটা নতুন জগতের জন্ম হলো। চন্দ্রমুখীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আর পার্বতীর ব্যাকুল চাহনি মিলেমিশে দু'টি নারী হৃদয়কে মিলিয়ে দেবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করল। দেবদাস সেখানে উপলক্ষ মাত্র।

এ রকম আরও বেশকিছু দৃশ্যের অবতারণা করা যায় যেখানে দেবদাস নয়, পারো ও চন্দ্রমুখীর প্রেম-বিরহ-ব্যাকুলতাকে সম্মুখবর্তী করে বিমল রায়ের দৃশ্য পরিচালনা। কলকাতা ফেরৎ দেবদাসের সঙ্গে যুবতী পার্বতীর সাক্ষাতের দৃশ্যগুলো মনে করা যেতে পারে। প্রায় প্রতিটি দৃশ্যই শুরু হয় পার্বতীর গৃহে। ক্যামেরা লক্ষ করে যায় পার্বতীর মুখমণ্ডলে আর দেহভঙ্গিমায় প্রেমের অনুভূতি আর আবেগ। এমনকি যে দু'টি মুহূর্তে পারো তার পূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেবদাসকে দেখে সে দু'টি দৃশ্যেও ক্যামেরা পারোর দৃষ্টিতেই দেখে দেবদাসকে। দেবদাসের দেখাটা ততটা গুরুত্ব পায় না যতটা গুরুত্ব পায় পারোর চোখ দিয়ে দেখা দেবদাস।

ছবির দ্বিতীয়াংশেও এমনটাই ঘটে। এ বার পারোর স্থানটা অধিকার করে চন্দ্রমুখী। বিমল রায়ের চোখ চন্দ্রমুখীর মনটাকে পড়তে চায় পরম আগ্রহে। চন্দ্রমুখীর দেহবিভঙ্গ, হাসি, ব্যাকুলতা আর অন্তর্ভেদী দু'টি চোখ আধিপত্য বিস্তার করে নাট্যে এবং দৃশ্যে। দেবদাসের মেলাঙ্কলিয়া নয়, পারোর বিরহ আর চন্দ্রমুখীর ব্যাকুলতা প্রধান হয়ে উঠে বিমল রায়ের 'দেবদাস'-এ।

নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে দেখলে বলা যায়, বিমল রায় ট্র্যাজেডির থেকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন বিরহ-রস সৃষ্টিতে। আইপিটিএ'র বিমল রায় নিউ থিয়েটার্সের ভক্তিমূলক ছবির অতীত থেকে যে উপাদান সংগ্রহ করছেন তা তিনি প্রয়োগ করছেন ১৯৫৫'র 'দেবদাস'-এ। তাঁর পক্ষে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হতো না শচীন দেব বর্মনের সুর সাহির লুধিয়ানভি'র কাব্য ছাড়া। এ দিক থেকে দেখলে শচীন কর্তা এবং সাহির লুধিয়ানভিকেও এ ছবির স্রষ্টার মর্যাদা দিতে হয়।

উদাহরণ চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। গ্রাম থেকে দেবদাসের শহর

যাত্রার পর একটিও শট নেই শহরের। বরং ক্যামেরা দেবদাসকে ছেড়ে পারোর সঙ্গে থেকে যায় তালসোনাপুর গ্রামে। পারোর নিঃসঙ্গ দুপুর আর বিরহ-কাতর সন্ধ্যা বিমল রায়কে অনেক বেশি করে টানে। আর বিরহের সুরটা ফুটে উঠে গানে। 'আন মিলো আন মিলো শ্যাম শাবরে/ব্রিজমে আকেলে রাধে খোই খোই ফিরে'—এটাই বিমল রায়ের 'দেবদাস'-এর মূল ভাবনা।

তাই বলছিলাম, দেবদাসের জন্য দুঃখ হয় এ কথা সত্য। কিন্তু পার্বতী ও চন্দ্রমুখীকে এ আধুনিকতা কোথায় নিয়ে ফেলল তার সন্ধান বরং এ বার শুরু হতে পারে।

কল্প প্রেমের কাহিনি

কিছু কিছু বন্ধুত্ব জীবনে এমনই প্রবল হয়ে যায় যে আলাদা করে আর প্রেমের জন্য জায়গা থাকে না। বন্ধুত্বের শেকড়ে গাঁথা বাল্যকালের প্রেমের গল্প, জীবনশেষে কী পরিণতি হয় তার? সবচেয়ে শুদ্ধ, সবচেয়ে গভীর প্রেম হয় জীবনের প্রথম প্রেমটি। সবকিছুর পরেও মনে স্থায়ী দাগ ফেলে দেয় প্রথম মন দেওয়া-নেওয়া। দেবদাস-পার্বতীর ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাসে বাল্যকালের এমনই এক করুণ প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এতে ফুটে উঠেছে প্রথম ব্যথা, প্রথম সুখ এবং প্রথম কারও জন্য নিজেকে ভুলে যাওয়ার গল্প।

এদের প্রেমের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেই চিরাচরিত সমাজ এবং পার্বতীর আত্মসম্মান। দেবদাস পার্বতীকে প্রত্যাখ্যান করে তার পরিবার ও সমাজের জন্য, আদতে যারা শেষপর্যন্ত তার আপন হতে পারেনি। পার্বতী ঠিক একই কাজ করে আত্মসম্মান থেকে। যে রাতে পার্বতী সবকিছুর পরোয়া না করে শুধুমাত্র তার দেবদাদার টানে চলে গিয়েছিল, দেবদাস তার মূল্য দিতে পারেনি। এবং অন্যের অপমান যতটা সহজে সহ্য করা যায়, যার জন্য সব অপমান সহ্য করে গিয়েছে পার্বতী, তার কাছ থেকে অপমান সে নিতে পারেনি। তাই জবাব দিয়েছে পাল্টা আঘাতে। সেই আঘাত তাদের দু'জনের জন্যই ছিল অনেক কঠিন, কিন্তু আত্মসম্মানটা একেবারে ছুড়ে ফেলে দিতে পারেনি সে।

উপন্যাসটির সবচেয়ে মধুর দিনগুলো ছিল তাদের বাল্যকাল, যখন তারা মণকষার অঙ্ক শিখতে থাকলেও দূরে ছিল জীবনের নানা হিসাবনিকাশ থেকেই। সম্পর্ককে কোনোকিছুর মাপে পরিমাপ করতে শেখেনি তখনও। পাঠশালায় পড়তে গিয়ে দেবদাসের পড়ায় ফাঁকি, পালিয়ে যাওয়া, লুকিয়ে থাকা এসবকিছুর সময়ই তার একজন সঙ্গী ছিল। সে পার্বতী, শুধুই পার্বতী।

এখানে দেখা মেলে ধর্মদাসেরও, দেবদাসের আরেক চির শুভাকাঙ্ক্ষী। দেবদাস আর পার্বতীর জন্য অনুকূল এক ব্যক্তি। দুষ্টুমি করে পালিয়ে যাওয়ার পর পার্বতী খাবার লুকিয়ে নিয়ে যায় তার দেবদার জন্য। এরপরও সুযোগ পেলেই সেই পারুকেই মারতো দেবদাস। এ যেন তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার আরেক ছল। তবু বড় সহজ এই সম্পর্ক। জটিলতার কিছুই চেনে না।

—তামাক খাবার কথা বলে দিলি কেন?

—তুমি মারলে কেন?

—তুই জল আনতে গেলি না কেন?

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল।

—তুই বড় গাধা, আর যেন বলে দিস নে।

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

–তবে চল, ছিপ কেটে আনি। আজ বাঁধে মাছ ধরতে হবে।

এভাবেই দূর হয়ে যেত বাল্যকালের সকল অভিযোগ-অভিমান আর রাগের কৌতূহল। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে সারাদিন একসাথে ঘুরে বেড়ানো, সকল ফন্দি-ফিকিরের সমান ভাগিদার। একজন দুঃখ দেয়, অপরজন হাসিমুখে তা মেনে নেয়। এই দুঃখ তার কাছে সকল সুখের চেয়ে বেশি দামি বলেই মনে হয়। যে দুঃখ দেয়, তার দুঃখ যেন অপরজনের চেয়েও বেশি। এমনই সহজ হিসেবে কেটে যায় তাদের দিনগুলো, যতটা নিজের জন্য, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি অপরজনের জন্য। প্রেম বুঝি এভাবেই শুরু হয়!

এমন প্রেমের ঘড়িতে বুঝি মিলনের পরেই শুরু হয় বিরহের ক্ষণ। দেবদাসকে পড়াশোনা করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কলকাতা শহরে, নিত্যদিনের সঙ্গী পারু রয়ে যায় সেই গ্রামেই। দেবদাসের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলোকে পুঁজি করে কাটে পারুর দিন, আর তার দেবদা হয়তো মিশে গিয়েছে আজ শহরের আলোয়। শীঘ্রই বাড়ি না ফেরত পাঠালে সে পালিয়ে আসবে–এমনটাই বলে গিয়েছিল পারুকে। কিন্তু হায়! সে পণও বুঝি ভাঙল। চিঠির অপেক্ষা আর চিঠি লেখা, এ দুই-ই হয়ে উঠে পারুর দিনাতিপাতের উপায়। এমন করে একদিন পার্বতী আবার পাঠশালায় যেতে চাইল, সে-ও পড়াশোনা করতে লাগল। অভ্যেসের পরিবর্তন হলেও স্মৃতিকাতরতা তাকে কখনোই ছাড়েনি। গ্রীষ্মের ছুটি হয়, দেবদাস বাড়ি আসে। অনেক কথা হয়, অনেক সময় কাটানোও হয়। তবু কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে আগেকার দিন! কেউই নেই আগের মতো, দেবদাস বদলে গিয়েছে একটু বেশিই।

"সমাজের কথা, রাজনীতির চর্চা, সভা-সমিতি-ক্রিকেট, ফুটবলের আলোচনা। হায় রে! কোথায় সেই পার্বতী, আর তাহাদের সেই তালসোনাপুর গ্রাম। বাল্যস্মৃতিজড়িত দুই-একটা সুখের কথা যে এখন আর মনে পড়ে না, তাহা নয়, কিন্তু নানান কাজের উৎসাহে সেইসকল আর বেশিক্ষণ হৃদয়ে স্থান পায় না।"

পরেরবার গ্রীষ্মের ছুটিতে দেবদাস বাড়ি আসেনি। বিদেশ বেড়াতে গিয়েছিল। তাই এবার পিতামাতার বহু জেদের ফলে তার আগমন ঘটল। আগমনের দিন পারুর সাথে দেখা হলো না, সে-ও এলো না। পরের দিন যখন পারুদের বাড়ি গেল, সবকিছু যেন নতুন রূপে তার সামনে ধরা দিলো। আগের সহজতা কেটে গিয়ে এসেছে রহস্যের চেহারা। দু'জনের মাঝেই লজ্জামাখা এক অনুভূতি তাতে চোখাচোখি যত হয়, কথা ততটা জমে না। একে অপরকে বিস্ময়ের চোখে দূর থেকে দেখে আর...

"মনে পড়ে, সেই পার্বতী এই পার্বতী হইয়াছে! পার্বতী মনে করে, সেই দেবদাস–এখন এই দেবদাসবাবু হইয়াছে!"

ঘটনাক্রমে দেবদাসের সাথে পারুর বিয়ের কথা ওঠে। প্রস্তাবটা আসে পারুর মায়ের কাছ থেকেই। কিন্তু জমিদারবাড়ির সাথে বুঝি ঠিক মিলটি হলো না, সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো।

এই সম্পর্ক যে বিয়ে ছাড়া চিরস্থায়ী হতে পারে না, এমন ভাবনা তাদের কেউই ভাবেনি। কিন্তু সকলের আলোচনা আর চারপাশের আবহাওয়া, একে অপরের প্রতি প্রবাসী লজ্জা এসব যেন এই সত্যটির প্রতিই নির্দেশ করছিল! তাই, কে জানিত সেই কিশোর-বন্ধন বিবাহ ব্যতীত কোনোমতেই চিরস্থায়ী করা যায় না! 'বিবাহ হইতে পারে না' এই সংবাদটা পার্বতীর হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহার বুকের চিতর হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল।

তবু মনে মনে দেবদাসকেই বর হিসেবে গ্রহণ করা পার্বতী যেন নিজের মধ্যে সকল কষ্ট সয়ে যেতে থাকে। সই মনোরমার কাছে সে এ

কথা স্বীকার করে। এ-ও বুঝতে পারে যে দেবদাস তাকে বিয়ে করবে কি না এই প্রশ্ন তাকে নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে হবে। এখানে এসে পার্বতীর চরিত্রের দৃঢ়তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। এখনের যুগেও মেয়েরা এমন পদক্ষেপ নিতে গেলে হাজারবার ভাববে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের পার্বতী সেই দ্বিধায় ভোগেনি।

গভীর রাতে সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে দেবদার ঘরে যায় পার্বতী। তার এই সাহসই বুঝিয়ে দেয় দেবদাসের প্রতি তার প্রেমের গাঢ়তা। দেবদাস চমকে যায়। পার্বতী কেন এভাবে এসেছে তার চাইতেও তার কাছে বড়ো হয়ে উঠে সম্মানের ব্যাপারটি। পার্বতীর বদনাম যাতে না ঘটে এজন্যই হয়তো তার এই দুর্ভাবনা। তারপর একটিমাত্র প্রশ্ন,

পারু, আমাকে ছাড়া কি তোমার উপায় নেই?

সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার হয়তো প্রয়োজন ছিল না। নীরবতাই সার। সেদিন রাতে আবার পার্বতীকে বাড়ি পৌঁছে দেয় দেবদাস।

কিন্তু উপায় হলো না, পিতা মানলেন না।

দেবদাসও পারুকে কিছু না জানিয়েই শহরে চলে গেল। পারুর মুখামুখি হওয়ার সাহস আর বাকি ছিল না তার মধ্যে। সেখান থেকে একটা চিঠি পাঠাল, যাতে লেখা ছিল পারু যেন তাকে ভুলে যায়। দেবদাসের চরিত্রের দুর্বলতা প্রথমবার প্রকাশ পায়, এবং এজন্যই প্রেমের গল্পটি মিলনের না হয়ে চির বিরহের খাতায় নাম লেখায়।

স্বাভাবিকভাবেই চিঠি পেয়ে পার্বতী ভেঙে পড়ে। কিন্তু আত্মসম্মান রক্ষার জন্যই তার মধ্যে দেবদাসের জন্য জন্ম নেয় ক্ষোভ। ভালোবাসার মানুষটির জন্য সকল অপমান সহ্য করা যায়, কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় অপমানটি যখন তার কাছ থেকেই আসে, তখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। পারুরও তা-ই হয়!

দেবদাস তার ভুল বুঝতে পারে, তবে কিছুটা দেরিতে। সে আবার বাড়ি ফিরে আসে। পারুর সম্মতিতেই বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে ততদিনে। অনেক চেষ্টা করেও দেবদাস কিছুদিন পারুর সাথে দেখা করতে পারল না। একদিন, পুকুরঘাটে দেখা মিলল পার্বতীর।

পূর্বের কথা মনে করিয়ে দিয়েও পাথর হয়ে যাওয়া পার্বতীর রুক্ষতা দূর হলো না। এবার বিয়ের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান এলো অপরপক্ষ থেকেই।

বিবাহ সুসম্পন্ন হলো। দু'জনেই ফিরে গেল দু'জনার গন্তব্যে, সঙ্গী থেকেও সঙ্গীবিহীন।

আত্মগ্লানি আর বিরহে দেবদাস বেছে নিল চুনিবাবুর সঙ্গ। চুনিবাবুর সাথে গিয়ে দেখা মিলল চন্দ্রমুখীর।

চন্দ্রমুখী, এই ত্রিভুজ প্রেমের আরেকটি অংশ। পেশায় বাইজি। সকলের মনোরঞ্জন করা তার কাজ, তবু স্বীয় ব্যক্তিত্বে সে প্রচণ্ড প্রবল। এই প্রবলতা দেবদাসকে ছুঁতেও পারল না, না কি অনেকখানি ছুঁয়ে দিলো? প্রথম দেখা থেকেই চন্দ্রমুখীর মন জুড়ে রইল দেবদাস। নিজের সর্বস্ব যেন বিনা ঘোষণায় সে সঁপে দিলো দেবদাসের চরণে।

এমনই সম্পর্কের জন্য যেন বলা যায়, "যাহা চাই তাহা পাই না। যাহা পাই তাহা ভুল করে পাই।"

সারা দিনরাত মদ্যপানে ডুবে গেল দেবদাস, চন্দ্রমুখী বা চুনিলাল কেউই তাকে ফেরাতে পারেনি। কী করে পারবে? এ ডুবে থাকা যে অন্য কারও জন্য। আজো সে শুধু পার্বতীর!

বয়স্ক স্বামীর দ্বিতীয়া স্ত্রী হয়ে ঘরকন্যা সামলাতে লাগল পার্বতী। এ ক'দিনেই তার মধ্যে এসে পড়েছে অদ্ভুত পরিপক্বতা! ভুবন চৌধুরীর জমিদারবাড়িতে পার্বতীই কর্ত্রী, তাকে তো পরিপক্ব হতেই হবে। সে যে

আর তার দেবদার খেলার সাথী নয়, আজ সে জমিদারগিন্নি! সৎ ছেলেমেয়ে সবার মন জয় করে নিল পারু। তার সংসার বেশ ভালোই চলতে লাগল। তবু মাঝে মাঝে আরশিতে এই সোনার মুখে চাঁদের সেই কলঙ্ক দেখে চোখ ভেজে কি? হয়তো ভেজে।

চন্দ্রমুখীই এখন দেবদাসের নিত্যদিনের সঙ্গী। কিন্তু জ্ঞানত তার কাছে দেবদাস আসতে পারে না। মাতাল না হলে এখানে সে পা ফেলতে পারে না। মদ্যপানে বারণ করলে সে বলে, সহ্য করব বলে মদ খাইনে। এখানে থাকব বলে শুধু মদ খাই।

শয়নে-স্বপনে-আধো জাগরণে সে মদের নেশায় চুর হয়ে থাকে, চন্দ্রমুখীকে 'সহ্য' করে। চন্দ্রমুখী নিঃস্বার্থ বন্ধুর মতো তার সঙ্গ দিয়ে যায়।

ত্রিভুজ প্রেমের এই গল্পে চন্দ্রমুখী সবসময়ই ফাঁকির খাতায় থেকেছে। দেবদাসের সঙ্গ পেয়েও সে কখনও তার জন্য 'একমাত্র' কিংবা 'প্রথম' হতে পারেনি। ওদিকে পারু আর দেবদাস স্মৃতিময় প্রেমে এতটাই আচ্ছাদিত যে দূরত্ব, সামাজিক বন্ধন কিছুই তাদের মন থেকে সেই চিরপ্রেমের অনুভূতি সরাতে পারেনি। তবু চন্দ্রমুখী নিজেকে দেবদাসের কাছে সঁপে দিয়ে শুদ্ধ হয়েছে। তার মনে হয়েছে একজন বাইজির জীবনে এটাই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।

শরৎচন্দ্রের ট্র্যাজিক উপন্যাস 'দেবদাস'। বেশ কিছু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এটি, একাধিকবার এ থেকে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্রও। এর রচনা ১৯০১ সালে ও প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালে। প্রথম চলচ্চিত্ররূপটি ছিল নির্বাক, ১৯২৮ সালে। বিরহের জন্য খ্যাত এর কাহিনি ও চরিত্রগুলো। বিরহের দুটো মাত্রা এখানে দেখতে পাই, দূরে থেকে দেবদাস ও পার্বতীর এবং কাছে থেকেও বিরহব্যথায় জর্জরিত চন্দ্রমুখীকে। বিরহের মাত্রা সর্বোচ্চ হওয়ার পরই উপন্যাসটির ইতি ঘটে। তালসোনাপুর গ্রামের চিত্রকল্পে সাজানো বাল্যকালের প্রেম, কলকাতা শহরের আধুনিক যুবা দেবদাস, পার্বতীর জমিদারি সংসার কিংবা চন্দ্রমুখীর সুরা ও সঙ্গীতে ঘেরা জীবনে ভক্তির গভীর ছায়া—সবকিছুই কিছুটা ব্যক্ত, কিছুটা অব্যক্ত করে প্রকাশিত হয়েছে। গভীরতায় চরিত্রগুলো অতল, প্রেমে অসীম, বিরহে প্রচণ্ড কাতর। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের সংস্কার, প্রথা আঁকড়ে ধরার রীতি এবং সেইসাথে বিলেতি কায়দার প্রতি একধরনের আকর্ষণ, জমিদারদের বাইজি নাচের প্রতি দুর্বলতা সব মিলিয়ে 'দেবদাস' উপন্যাসটি একটি স্পষ্ট ছবি দেওয়ার চেষ্টা তখনকার সময় ও সমাজ সম্পর্কে। সংস্কারের প্রাচীন দেওয়াল ভেঙে অসম প্রেম মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও তাকে চাপা পড়তে হয় পরম্পরার বোঝার নিচে। ভাগ্যে লেখা থাকে শুধুই বিরহ ও স্মৃতিমেদুরতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহরে রৌদ্রেরও অন্ত ছিল না, উত্তাপেরও সীমা ছিল না। ঠিক সেই সময়টিতে মুখুয্যেদের দেবদাস পাঠশালা-ঘরের এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া, শ্লেট হাতে লইয়া, চক্ষু চাহিয়া, বুজিয়া, পা ছড়াইয়া, হাই তুলিয়া, অবশেষে হঠাৎ খুব চিন্তাশীল হইয়া উঠিল; এবং নিমিষে স্থির করিয়া ফেলিল যে, এই পরম রমণীয় সময়টিতে মাঠে মাঠে ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়ানোর পরিবর্তে পাঠশালায় আবদ্ধ থাকাটা কিছু নয়। উর্বর মস্তিষ্কে একটা উপায়ও গজাইয়া উঠিল। সে শ্লেট-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাঠশালায় এখন টিফিনের ছুটি হইয়াছিল। বালকের দল নানানরূপ ভাবভঙ্গী ও শব্দসাড়া করিয়া অনতিদূরের বটবৃক্ষতলে ডাংগুলি খেলিতেছিল। দেবদাস সেদিকে একবার চাহিল। টিফিনের ছুটি সে পায় না—কেননা গোবিন্দ পণ্ডিত অনেকবার দেখিয়াছেন যে, একবার পাঠাশালা হইতে বাহির হইয়া পুনরায় প্রবেশ করাটা দেবদাস নিতান্ত অপছন্দ করে। তাহার পিতারও নিষেধ ছিল। নানান কারণে ইহাই স্থির হইয়াছিল যে এই সময়টিতে সে সর্দার-পোড়ো ভুলোর জিম্মায় থাকিবে।

এখন ঘরের মধ্যে শুধু পণ্ডিত মহাশয় দ্বিপ্রাহরিক আলস্যে চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং সর্দার-পোড়ো ভুলো এক কোণে হাত-পা ভাঙা একখণ্ড বেঞ্চের উপর ছোটখাটো পণ্ডিত সাজিয়া বসিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত কখন বা ছেলেদের খেলা দেখিতেছিল, কখন বা দেবদাস এবং পার্বতীর প্রতি আলস্য-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিল। পার্বতী এই মাসখানেক হইলো পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্রয়ে এবং তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় সম্ভবতঃ এই অল্পসময়ের মধ্যেই তাহার একান্ত মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তাই সে নিবিষ্টমনে, নিরতিশয় ধৈর্যের সহিত সুপ্ত পণ্ডিতের প্রতিকৃতি বোধোদয়ের শেষ পাতাটির উপর কালি দিয়া লিখিতেছিল এবং দক্ষ চিত্রকরের ন্যায় নানানভাবে দেখিতেছিল যে, তাহার বহু-যত্নের চিত্রটি আদর্শের সহিত কতখানি মিলিয়াছে। বেশি যে মিল ছিল তাহা নয়; কিন্তু পার্বতী ইহাতেই যথেষ্ট আনন্দ ও আক্ষপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিল।

এই সময় দেবদাস শ্লেট-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভুলোর উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল, অঙ্ক হয় না।

ভুলো শান্ত গম্ভীরমুখে কহিল, কী আঁকো?

মণকষা—

শেলেটটা দেখি—

ভাবটা এই যে, তাহার নিকট এসব কাজে শ্লেটখানি হাতে পাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। দেবদাস তাহার হাতে শ্লেট দিয়া নিকটে দাঁড়াইল। ভুলো ডাকিয়া লিখিতে লাগিল যে, এক মণ তেলের দাম যদি চৌদ্দ টাকা নয় আনা তিন গণ্ডা হয়, তাহা হইলে—

এমনি সময়ে একটা ঘটনা ঘটিল। হাত-পা-ভাঙা বেঞ্চখানার উপর সর্দার-পোড়ো তাহার পদমর্যাদার উপযুক্ত আসন নির্বাচন করিয়া যথানিয়মে আজ তিন বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন বসিয়া আসিতেছে। তাহার পশ্চাতে একরাশি চুন গাদা করা ছিল। এটি পণ্ডিত মহাশয় কবে কোন যুগে নাকি সস্তা দরে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, মানস ছিল, সময় ভালো হইলে ইহাতে কোঠা-দালান দিবেন। কবে যে সে শুভদিন আসিবে তাহা জানি না। কিন্তু এই শ্বেত-চূর্ণের প্রতি তাঁহার সতর্কতা এবং যত্নের অবধি ছিল না। সংসারানভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী কোন অলক্ষ্মী-আশ্রিত বালক ইহার রেণুমাত্র নষ্ট না করিতে পারে, এইজন্য প্রিয়পাত্র এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ভোলানাথ এই সযত্ন-সঞ্চিত বস্তুটি সাবধানে রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছিল এবং তাই সে বেঞ্চের ওপর বসিয়া ইহাকে আগুলিয়া থাকিত।

ভোলানাথ লিখিতেছিল—এক মণ তেলের দাম যদি চৌদ্দ টাকা নয়